‘সনাতন ধর্মে’র দৃষ্টিতে নারী

অনন্ত বিজয় দাশ

যে কোনো দেশ-কাল-প্রেক্ষাপটের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় অনিবার্যভাবেই নারীর অবস্থান নিয়ে আলোচনা চলে আসে; অর্থাৎ আমরা চাই বা না-চাই, নারীর অবস্থান দিয়ে বিবেচনা করা হয়, ঐ দেশ-কাল-প্রেক্ষাপট কতটা আধুনিক, কতটা প্রগতিশীল-মানব-কল্যাণকামী, কিংবা কতটা অনাধুনিক, প্রগতিবিরোধী, জড়-বন্ধ্যাগ্রস্থ; কারণ অবশ্য আছে—নারী সর্বত্রই, সর্বদা সমাজের অর্ধেক, তা সত্ত্বেও নারী যুগ-যুগ ধরে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার যাতাকলে পড়ে নিষ্পেষিত-নিগৃহীত-নির্যাতিত হচ্ছে। এ সমাজে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র আর সম্পত্তির উপর পূর্ণ অধিকার স্বীকার তো অনেক দূরের বিষয়, পরিবারের অবৈতনিক দাসী, সন্তান উৎপাদনের যৌনযন্ত্র, আর পুরুষের চিত্ত-বিনোদনের খোরাক কিংবা ভোগ্যপণ্য হওয়া ছাড়া নারীর আর কোনো স্বতন্ত্র ভূমিকা আছে, তা মানতে এখনো সমাজের অনেকেই ইতঃস্তত বোধ করেন, দ্বিধান্বিত হন। জানি, কোথাও কোথাও ব্যতিক্রম হয়তো আছে; যেমন যাযাবর জাতি, পর্বতবাসী, বনবাসী, দ্বীপবাসী প্রভৃতি কিছু প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থান ঊর্ধ্বমুখী, নারীর মর্যাদা পুরুষের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ। কিন্তু এ কথাও সত্য, পুরুষের বাহুবল, তথাকথিত লিঙ্গ-বৈষম্য, ধর্মীয় বিধি-বিধান-শাস্ত্র-পুরোহিতের প্রতাপ-প্রপাগান্ডা, উৎপাদনব্যবস্থা-প্রযুক্তির দ্রুত বিশ্বায়নের চাপের ফলে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ক্রমশ ভেঙে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মোড় নিচ্ছে। ফলে সারা বিশ্বেই নারীকে শোষণ-নিপীড়ন-শৃঙ্খলিত করার ব্যাপ্তি দীর্ঘতর হচ্ছে। আবার ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যেই পিতৃতান্ত্রিকতার বিপক্ষে নারীর অধিকার রক্ষা, নারী-মুক্তি-স্বাধীনতার আন্দোলন গড়ে উঠছে (এজন্যই তসলিমা নাসরিনদের মতো মহিয়সী নারীর আবির্ভাব ঘটছে...)। সমাজে নারীর বর্তমান অবস্থান নিয়ে পুনর্বিবেচনা করা হচ্ছে; নারীর পরাধীনতার শিকলকে ভেঙে চুড়ে দেবার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষিত হচ্ছে দিকে দিকে; হাজার-হাজার বছরের জীর্ণ ধ্যান-ধারণা, প্রথা আর নিয়মের বেড়াজাল নির্মোহে ভেঙে নারীর ক্ষমতায়নের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চলছে। এতে স্বাভাবিকভাবেই কায়েমী স্বার্থবাদীরা নিজের অবস্থান নিয়ে শঙ্কিত, তটস্থ। দেখা যায় সুদূর অতীতকাল থেকে কায়েমী গোষ্ঠী সমাজের কোনো না কোনো অংশকে, শ্রেণী-বর্ণ-সম্প্রদায়কে (সামগ্রিক অর্থে নারীকে) দাবিয়ে রেখে, শোষিত করে নিজের আখের ঠিক রাখার জন্য ঐশ্বরিক বিধান-শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে আসছে; বরাবরের মতো শাষকগোষ্ঠীর মন্ত্রণাদাতা (পঞ্চম বাহিনী) এ সমাজের কথিত ‘বুদ্ধিজীবী’ (অধ্যাপক, কবি, লেখক, নাট্যকার, ইতিহাস-রচয়িতা, সহজ ভাষায় আমাদের এখানে যাদের ‘সুশীল সমাজে’র প্রতিনিধি বলা হয়) এ ক্ষেত্রে নিরলস সহযোগিতা করেছে। কেউবা নারীকে পূর্ণ মানবরূপে বিবেচনা না করে, জৈবিক সত্তাকে অস্বীকার করে, তথাকথিত কাব্যিক ব্যঞ্জনায় ‘অর্ধ-মানবী’ বিশেষণে ভূষিত করে নারীকে রহস্যময় বানিয়েছে! এতে পিতৃতন্ত্রেরই দারুন লাভ; ভুলিয়ে-ভালিয়ে আরো কিছুদিন নারীকে অন্তপুরে অথবা অধঃস্তন করে রাখা সম্ভব। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে পিতৃতন্ত্রের গর্বিত প্রতিনিধি আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহুল প্রচলিত গানের কলি : ‘শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী!/পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি।’ কিংবা ‘অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা’। কবিদের চোখে নারী অর্ধেক কল্পনা তো বটেই, সাথে ওই ‘মানবী’টুকুও কল্পনা; অর্থাৎ নারী এক সম্পূর্ণ অবাস্তব সত্তা বা ভাব। নারীর জৈব সত্তার কোনো স্বীকৃতি তাঁদের কাছে নেই। ড. হুমায়ুন আজাদ তাঁর *নারী* গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১৯) বলেন—“পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতা নারী সৃষ্টি না করলেও নারী ধারণাটি পুরোপুরি পুরুষের সৃষ্টি : পুরুষ নারীকে নানা শব্দে শনাক্ত করেছে, নারীর সংজ্ঞা রচনা করেছে, সংজ্ঞার ভাব ব্যাখ্যা করেছে, নারীর অবস্থান নির্দেশ করেছে, নারীর জন্য বিধি প্রণয়ন করেছে, এবং নিযুক্ত করেছে নিজের কামসঙ্গী ও পরিচারিকার পদে।”

আমাদের সমাজ-সংস্কৃতিতে জৈবিক নারীকে এমনভাবে শিক্ষা-দীক্ষা দেয়া হয়, জন্মের পর থেকেই, যাতে তাদের মধ্যে নারীত্ব বা নারীধর্ম প্রবলরূপে বিকাশ লাভ করে। নারীত্ব বা নারীধর্ম বলতে কী বোঝায়? সোজা ভাষায় বলা

যায় : ‘পুরুষের (পিতা, ভাই, স্বামী) আজ্ঞাবাহী সদাসেবায় নিয়োজিত এক জীব।’ আর আমাদের সমাজে নারীদের ক্ষেত্রে ‘সতী’ বা ‘চরিত্র’ বলতে শুধুমাত্র যৌনশুচিতাকেই বোঝায়, কিন্তু পুরুষের যৌন মাধুকরীবৃত্তিকে বহুভাবে প্রশয় দেয়া হয় (এ সমাজে ‘সতী’ শব্দের অনুরূপ অর্থে পুংলিঙ্গ প্রতিশব্দ আগেও ছিল না, এখনো নেই); সেখানে নারীর সামান্যতম পদস্খলন বরাবরই চূড়ান্তভাবে দণ্ডিত হয়ে এসেছে। আমাদের সমাজে যে ‘অর্ধমানবী’ নারী দেখা যায়, কোনো জৈব, মনস্তাত্ত্বিক বা অর্থনৈতিক ভাগ্য তার রূপ স্থির করে না; সমগ্র সভ্যতাই উৎপাদন করে, তৈরি করে পুরুষ ও খোজার মাঝামাঝি এ প্রাণিটিকে, যাকে বলা হয় ‘নারী’। তাই তো বিখ্যাত নারীবাদী সিমোন দ্য বোভোয়ার তাঁর *দ্বিতীয় লিঙ্গ* গ্রন্থে বলেছিলেন, ‘কেউ নারী হয়ে জন্ম নেয় না, ক্রমশ নারী হয়ে ওঠে।’

ধর্মবাদীরাসহ অনেক সাধারণ মানুষ প্রায়ই জোর গলায় বলে থাকেন সকল ধর্মেই নারীকে জননীর (সর্বোচ্চ) সম্মান দেয়া হয়েছে (উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সেই ‘জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী’ বহুল উদ্ধৃত-পঠিত বাক্যটি) এবং তার প্রতি সম্মান-কর্তব্য-দায়িত্বের ওপর কম-বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে! তারা একে নারীর অধিকারের স্বীকৃতি বা নারীর মর্যাদার সাথে সমার্থকরূপে দেখেন বা দেখিয়ে থাকেন। এই দেখা বা দেখানোর পেছনে হয়তোবা তাদের মধ্যে নারী সম্পর্কে সদর্থক প্রেরণা কাজ করে। কিন্তু এটাও সত্য, নারী সম্পর্কিত এ ধরনের ভালো-ভালো (!) বক্তব্যের পাশাপাশি সুদীর্ঘকাল থেকে আজকের দিনেও আমাদের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, সব ধর্মীয় বিধিবিধানে-উপাখ্যানে নারী সম্পর্কিত নানা কুসংস্কার-অপসংস্কারের ফলগুধারা বহমান; নারী অশুভ, মানুষের (পুরুষদের) স্বর্গ থেকে পতনের কারণ এই নারী, নারী শয়তানের ফাঁদ, নারী নরকাগ্নির ইন্ধন, রূপবান বা কুরূপ বিচার না করেই পুরুষ দেখলেই কামক্রিয়ায় রত হওয়ার জন্য নারীর চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে, সৃষ্টিগতভাবে নারী বক্রস্বভাবের, নারী পুরুষের পাজরের হাড় থেকে সৃষ্টি—ইত্যাদি কুৎসিৎ ধ্যান-ধারণা-কুসংস্কার আজকের একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের চূড়ান্ত উৎকর্ষতার যুগে এসেও বেশিরভাগ মানুষ (ধর্মবাদীরাসহ) মেনে নেয় বিনা প্রশ্নে, বিনা যুক্তিতে! তাঁদের দৃষ্টিতে নারী কখনোই স্বাধীনতার যোগ্য নহে (... ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি)! মজার বিষয় হচ্ছে, প্রায়শই ছদ্ম-প্রগতিশীলরা নারী সম্পর্কিত ভালো ভালো কথাগুলো বুক ফুলিয়ে প্রচার চালালেও সমাজ-জীবনে, ব্যক্তিজীবনে প্রয়োগের ক্ষেত্রে নারী সম্পর্কিত নঞ্চর্থক ধারণাকেই প্রাধান্য দেন বেশি! (তবে রক্ষণশীল বা মৌলবাদীরা যেমনটা বিশ্বাস করেন, দৃষ্টিভঙ্গি যেমন, তেমনটি প্রচার চালান, প্রয়োগও করেন ব্যক্তিগত জীবনে তেমনটিই) কেন ছদ্ম-প্রগতিশীলদের এরকম স্ববিরোধী আচরণ? কারণ—যাবতীয় ধ্যান-ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি তো এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামো থেকে সামাজিকীকরণের সময় ব্যক্তির ভিতর বিকশিত হয়; পরিবার-আত্মীয়স্বজন-প্রতিবেশীর কাছ থেকে সে যা দেখে, শুনে, বুঝে তাই সে শেখে, তার বিশ্লেষণের ক্ষমতা-দৃষ্টিভঙ্গিও সেরকমই হয়। মাঝে কিছুকাল তথাকথিত ‘আধুনিক শিক্ষা’ লাভের ফলে ব্যক্তির এতদিনকার ধ্যান-ধারণা-দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈপরীত্ব বা দ্বন্দ্ব শুরু হয়। যার কারণেই ব্যক্তির মধ্যে এরকম স্ববিরোধী আচরণ লক্ষ্য করা যায়। আজকের দিনে আমাদের দেশে বা অন্যত্র নারী-মুক্তিবিরোধী বা প্রগতিবিরোধীরা তাঁদের বক্তব্যের পক্ষে সবচেয়ে বেশি যে যুক্তি দেন, তা-হল নারী সম্পর্কিত ধর্মীয় বিধি-বিধানের। এ প্রবন্ধে নারী সম্পর্কিত হিন্দু ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আলোচনাটি সীমাবদ্ধ রাখব (আর হিন্দু ধর্মের ধর্মগ্রন্থ যেহেতু অনেক, তাই সবগুলো ধর্মগ্রন্থ থেকে নয়, বরং হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী কয়েকটি ধর্মগ্রন্থকেই প্রাধান্য দেয়া হবে) কারণ : এক, প্রবন্ধের কলেবর যেন বিশাল হয়ে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি না ঘটায়; দুই, বিষয়ের ভিত্তি যেন ঠিক থাকে; সর্বশেষ তিন, আমার মতো নগন্য লেখকের সামর্থ্যের বিষয়টিও জড়িত আছে। সনাতন হিন্দু ধর্মের তথাকথিত প্রগতিশীল লোকেরা সময়-সুযোগ পেলেই বড়াই করে বলে বেড়ান, হিন্দু ধর্মে না-কী নারীদের যথেষ্ট স্বাধীনতা-সম্মান দেয়া হয়েছে; নারীদের মাতৃজ্ঞানে এ ধর্মে পূঁজা করা হয়; হিন্দু নারীরা অন্যান্য ধর্মের তুলনায় অনেক বেশি প্রগতিশীল! এ ধরনের বক্তব্য প্রচারের কারণ আছে; পশ্চিমা সামাজ্যবাদের বর্তমান চক্ষুশুল ইসলামি মৌলবাদ নিয়ে সারা বিশ্বের গণমাধ্যমগুলো ব্যস্ত থাকায় ফাঁক দিয়ে সুযোগ বুঝে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের ধর্মকে প্রগতিশীল, যুগোপযুগী, নারী স্বাধীনতার পক্ষে—ইত্যাদি তকমা ব্যবহার (ব্রেনওয়াশ!) করার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছেন। এ

প্রবন্ধে আমি শুধুমাত্র প্রগতিশীল দাবিদার হিন্দুধর্মাবলম্বীদের দাবিগুলোর যথার্থতা নিরুপণের জন্য হিন্দু ধর্মীয় অনুশাসনগুলোর 'কিছু' দৃষ্টান্ত হাজির করার চেষ্টা করবো। আমি মনে করি, এই 'কিছু', অনেক কিছু বোঝার জন্য যথেষ্ট। স্বীকার করে নিচ্ছি, এটি কোনো মৌলিক প্রবন্ধ নয়; বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন লেখা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সংকলিত করা হয়েছে মাত্র। আর একটি কথা, প্রবন্ধের শিরোনামটি আমার নিজেরও পছন্দ নয়; হিন্দু ধর্ম কী করে 'সনাতন' ধর্ম হতে পারে সেটা আমি নিজেও বুঝি না। শুধু হিন্দু ধর্ম কেন, পৃথিবীর কোনো ধর্মই কি 'সনাতন' হতে পারে? অন্তত ধর্মের সমাজবৈজ্ঞানিক-নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস যারা জানেন, তাদের কাছে এই 'সনাতন' শব্দটি অত্যন্ত খেলো মনে হবে। কিন্তু হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা যেহেতু নিজেদের ধর্মকে 'সনাতন হিন্দু ধর্ম' নাম দিয়ে চিহ্নিত করেন, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রবন্ধের নামকরণটি এরকম হল।

এবার মূল আলোচনায় আসি। বলা হয়ে থাকে হিন্দুধর্মের মূল গ্রন্থ বেদ। এজন্য অনেকে হিন্দুধর্মকে বৈদিক ধর্ম হিসেবেও অভিহিত করে থাকেন। হিন্দুধর্মের বেদ চারটি; যথা ঋগ্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ ও যজুর্বেদ। এই যজুর্বেদ দুই ভাগে বিভক্ত—একটি হচ্ছে কৃষ্ণযজুর্বেদ বা তৈত্তরীয় সংহিতা অন্যটি শুক্লযজুর্বেদ; এই শুক্লযজুর্বেদ আবার দুই ভাগে বিভক্ত, একটি শতপথ ব্রাহ্মণ এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদ। শুক্লযজুর্বেদের অন্তর্গত শতপথ ব্রাহ্মণে নারীকে তুলনা করা হয়েছে এভাবে, "সে ব্যক্তিই ভাগ্যবান, যার পশুসংখ্যা স্ত্রীর সংখ্যার চেয়ে বেশি" (২/৩/২/৮)। শতপথ ব্রাহ্মণের এ বক্তব্যকে হয়তো দরদী ধর্মবাদীরা ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে যৌক্তিকতা দিতে চেষ্টা করবেন, কিন্তু পরের আরেকটি শ্লোকে পাওয়া যায় হিন্দু ধর্মের দৃষ্টিতে নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান; "বজ্র বা লাঠি দিয়ে নারীকে দুর্বল করা উচিৎ, যাতে নিজের দেহ বা সম্পত্তির উপর কোনো অধিকার না থাকতে পারে" (৪/৪/২/১৩)। এর থেকে স্পষ্ট কোনো বক্তব্যের আর প্রয়োজন আছে? বৃহদারণ্যকোপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবাল্ক্য বলেন, "স্ত্রী স্বামীর সম্ভোগকামনা চরিতার্থ করতে অসম্মত হলে প্রথমে উপহার দিয়ে স্বামী তাকে 'কেনবার' চেষ্টা করবে, তাতেও অসম্মত হলে হাত দিয়ে বা লাঠি দিয়ে মেরে তাকে নিজের বশে আনবে" (৬/৪/৭, ১/৯/২/১৪)। দেবীভাগবত-এ নারীর চরিত্র সম্পর্কে বলা আছে (৯:১): "নারীরা জোঁকের মত, সতত পুরুষের রক্তপান করে থাকে। মুর্খ পুরুষ তা বুঝতে পারে না, কেননা তারা নারীর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। পুরুষ যাকে পত্নী মনে করে, সেই পত্নী সুখসম্ভোগ দিয়ে বীর্য এবং কুটিল প্রেমালাপে ধন ও মন সবই হরণ করে।" বাহ্! হিন্দুরা না-কি মাতৃজ্ঞানে দেবীর (দূর্গা, কালি, মনসা, স্বরসতী, লক্ষী) পূজা করে? 'নারী' সম্পর্কে যাদের ধর্মীয় বিধানে এমন হীন বক্তব্য রয়েছে, তারা দেবীর পূজা করলেই কী আর না-করলেই কী? ঋগ্বেদ বা অন্যান্য বেদ, উপনিষদে কয়েকজন বিদুষী ও শাস্ত্রজ্ঞ নারীর নাম জানা যায়, যারা বিভিন্ন শ্লোক রচনা করেছিলেন; তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হচ্ছেন লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, গার্গী, বাৎসী, বাক্, অপালা, সূর্যা, ইন্দ্রাণী প্রভৃতি। আধুনিককালে কেহ কেহ এই বিদুষী নারীদের নাম দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে চান, সেকালে নারীরা কতটুকু স্বাধীন ছিল যে, তাঁরা বেদের শ্লোক পর্যন্ত রচনা করেছিলেন! অস্বীকার করা যাবে না, সেকালে কয়েকজন নারী শ্লোক-মন্ত্র রচনা করে শিক্ষাক্ষেত্রে নিজেদের স্বতন্ত্র্য অবস্থান প্রমাণ করে গেছেন। কারণ ধর্মগ্রন্থকে ঘিরেই ছিল সেকালের শিক্ষা। তবে একটা উদাহরণ দিলেই বুঝা যাবে, তৎকালীন সমাজে এ বিদুষী নারীদের অবস্থান কি রকম ছিল? (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম থেকে পঞ্চম শতকের মধ্যে রচিত) বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখা যায়, খ্যাতনামা ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য এবং অন্যান্য ঋষিদের সাথে এক সভায় ঋষি বাচাক্লুর কন্যা গার্গী ব্রহ্মজ্ঞান নিয়ে তর্কে লিপ্ত হয়ে নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেন। একসময় যাজ্ঞবল্ক্য ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠেন, "হে গার্গী, আর বেশি প্রশ্ন করো না, তাহলে তোমার মাথা খসে পড়ে যাবে!" (৩/৬/১); যাজ্ঞবল্ক্যের বক্তব্যে গার্গী থেমে গেলেন পরবর্তীতে স্বীকার করলেন, ব্রহ্মবিদ্যায় যাজ্ঞবল্ক্যকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না (৩/৮/১-১১)। আবার যে নারীরা বেদের-উপনিষদের শ্লোক-মন্ত্র রচনা করেছেন, সেই নারীদের উত্তরসূরীদের জন্য মনু বেদসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পাঠের অধিকার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, "নারীরা ধর্মজ্ঞ নয়, এরা মন্ত্রহীন এবং মিথ্যার ন্যায় (অশুভ)—এই শাস্ত্রীয় নিয়ম" (মনুসংহিতা, ৯/১৮)।

হিন্দুধর্মের ইতিহাসে সেই কুখ্যাত সতীদাহ বা সহমরণের কথা প্রথম জানা যায় অথর্ববেদে, "... জীবিত নারীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মৃতের বধু হতে" (১৮/৩/৩); "এই নারী পতিলোকে যাচ্ছে, এ প্রাচীন রীতি অনুসরণ করছে..." (১৮/৩/৩/১)। এ প্রাচীন রীতি কত পুরানো? এটি আর্য না প্রাগার্য সংস্কৃতি? কারণ আমরা ইন্দো-ইয়রোপীয় অন্য সভ্যতাগুলিতে আমরা সহমরণের কথা তো পাই না। উত্তরগুলো আমার জানা নেই। তবে পাঠক, আপনারা হয়তো ইতিহাস পাঠের কারণে জানেন, এই বাংলায় ১৮১৫ সাল থেকে ১৮২৮ সাল পর্যন্ত মাত্র তের বছরে ব্রাহ্মণ্যবাদীর দল পুণ্যলাভের আশায় আর নারীর সতীত্ব (?) রক্ষার ধুয়া তুলে ৮১৩৫ জন নারীকে আগুনে পুড়িয়ে মেরে সতী বানিয়েছিল! একটু ভাবুন তো, একটি নিরাপরাধ মেয়েকে টেনে-হিচড়ে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলছে, পাশে মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন সক্কলে দাঁড়িয়ে 'বল হরি বল' কীর্তন গেয়ে নিজেদের স্বর্গে যাবার আয়োজন করছে, ভাবতেই তো গা গুলিয়ে উঠে! মানুষ কী পরিমাণ পাষণ্ড-হারামি-ধর্মান্ধ হলে এরকম কাজ করতে পারে? 'ধর্ম' নামক আফিমীয় মাদক মানুষকে কতটুকু নিবোর্ধ-মানবিকতাশূণ্য বানিয়ে দেয়, তারই উদাহরণ হতে পারে উপমহাদেশের এই সতীদাহ প্রথা।

মনুসংহিতা এবং নারী : হিন্দু আইনের মূল উৎস হচ্ছে এই 'মনুসংহিতা' এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছেও এটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বিবেচ্য। এই ধর্মগ্রন্থে নারীর কর্তব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে,—"বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ/পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোহগ্নিপরিক্রিয়া॥" (২:৬৭), অর্থাৎ—স্ত্রীলোকদের বিবাহবিধি বৈদিক সংস্কার বলে কথিত, পতিসেবা গুরুগৃহেবাস এবং গৃহকর্ম তাদের (হোমরূপ) অগ্নিপরিচর্যা; আবারও বলে দেয়া হয়েছে নারীর কর্তব্য—গৃহকর্ম এবং সন্তান উৎপাদন (৯:২৬)। সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্যই নারী এবং সন্তান উৎপাদনার্থে পুরুষ সৃষ্টি হয়েছে (৯:৯৬)। যে সকল নারী একদা বৈদিক মন্ত্র-শ্লোক পর্যন্ত রচনা করেছিলেন, তাদের উত্তরসূরীদের জন্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত-অমন্ত্রক (২:৬৬); নারী মন্ত্রহীন, অশুভ (৯:১৮)। কন্যা, যুবতী, রোগাদি পীড়িত ব্যক্তির হোম নিষিদ্ধ এবং করলে নরকে পতিত হয় (১১:৩৭)! স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে (৫:১৫৪)—"বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্বা পরিবর্জিতঃ/উপচর্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ॥" বাংলা করলে দাঁড়ায়, স্বামী দুশ্চরিত্র, কামুক বা নির্গুণ হলেও তিনি সাধ্বী স্ত্রী কর্তৃক সর্বদা দেবতার ন্যায় সেব্য। পরবর্তী শ্লোকে রয়েছে, কোনো নারী (স্ত্রী) যদি স্বামীকে অবহেলা করে, ব্যভিচারিণী হলে সংসারে তো নিন্দিত হবেই সাথে-সাথে যক্ষা, কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়, শুধু তাই নয় পরজন্মে শৃগালের গর্ভে জন্ম নিবে সেই নারী (৫:১৬৩-১৬৪)। স্ত্রীদের জন্য স্বামী ছাড়া পৃথক যজ্ঞ নেই, স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোনো ব্রত বা উপবাস নেই, শুধু স্বামীর সেবার মাধ্যমেই নারী স্বর্গে যাবে (৫:১৫৫)। সাধ্বী নারী কখনো জীবিত অথবা মৃত স্বামীর অপ্রিয় কিছু করবেন না (৫:১৫৬)। স্বামী মারা গেলে স্ত্রীদের কি করতে হবে—"কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুস্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ/ন তু নামাপি গৃহ্নীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু॥" (৫:১৫৭), সহজ ভাষায় বাংলা করলে হয়, স্ত্রী সারা জীবন ফলমূল খেয়ে দেহ ক্ষয় করবেন, কিন্তু অন্য পুরুষের নামোচ্চারণ করবেন না। কিন্তু স্ত্রী মারা গেলে স্বামী কি করবেন, "ভার্যায়ৈ পূর্বমারিণ্যৈ দত্ত্বাগ্নীনন্ত্যকর্মণি/পুনর্দারক্রিয়াং কুর্যাৎ পুনরাধানমেব চ॥" (৫:১৬৮), এই শ্লোকেরও বাংলা শুনুন, দাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করে স্বামী আবার বিয়ে এবং অগ্ন্যাধ্যান করবেন। সত্যি! নারী-পুরুষের মধ্যে কী চমৎকার সমতা!! কেহ কেহ বলেন, 'মনুবাদ' থেকেই না-কি 'মানবতাবাদ' এসেছে! দারুন! ধন্য মোরা মনুর প্রতি! আবার এই 'মনুবাদ' না-কী হিন্দু আইনের উৎস! নারীর গুণাবলী নিয়ে মনু বলেন, নারীর কোনো গুণ নেই, নদী যেমন সমুদ্রের সাথে মিশে লবনাক্ত (সমুদ্রের গুণপ্রাপ্ত) হয়, তেমনই নারী বিয়ের পর স্বামীর গুণযুক্ত হন (৯:২২)। নারীর স্বাধীনতা সম্পর্কে মনুর সংহিতাতে বলা আছে : "অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ পুরুষৈঃ স্বৈর্দ্দিবানিশম্/ বিষয়েষু চ সজ্জন্ত্যঃ সংস্থাপ্যা আত্মনো বশে॥" (৯:২), অর্থাৎ স্ত্রীলোকদের স্বামীসহ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ দিনরাত পরাধীন রাখবেন, নিজের বশে রাখবেন...; আবার এর পরেই আছে বিখ্যাত সেই শ্লোক : "পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে/রক্ষতি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥" (৯:৩) অর্থাৎ স্ত্রীলোককে পিতা কুমারী

জীবনে, স্বামী যৌবনে ও পুত্র বার্ধক্যে রক্ষা করে; (কখনও) স্ত্রীলোক স্বাধীনতার যোগ্য নয়। এখন যারা (সনাতনবাদীরা) নারীমুক্তির বিষয়ে নিজ ধর্মের পক্ষে সাফাই গান, তাদের কাছে আমার প্রশ্ন, এই শ্লোক দেখে তারা কী ব্যাখ্যা দেবেন? নিশ্চয়ই আমতা আমতা করে ছলনা-শঠতার মাধ্যমে যৌক্তিকতা (বাস্তব উপযোগিতা) দানের চেষ্টা করবেন, কিংবা অস্বীকার করে বসবেন, আদৌ এ ধরনের কোনো শ্লোক কোথাও নেই! নারী সম্পর্কে ঘৃণ্য দৃষ্টিভঙ্গি ছড়িয়ে আছে সমগ্র মনুসংহিতা জুড়েই; নারীনিন্দায় মনুসংহিতা শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করে গেছে। মনুর দৃষ্টিতে নারী স্বভাবব্যভিচারিণী, কামপরায়ণা; কাম, ক্রোধ, পরহিংসা, কুটিলতা ইত্যাদি যত খারাপ দোষ আছে, সবই নারীর বৈশিষ্ট্য, এসবই দিয়ে নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে! তবু সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের এসব কিছুই নজরে আসে না, তাঁরা উদয়-অস্ত খুঁজে বেড়ান ইসলামধর্ম, খ্রিস্টানধর্ম, বৌদ্ধধর্ম নারীদের কোন্ অধিকার দিয়েছে, আর কোন্ অধিকার দেয়নি! আলোচনায় মশগুল কোথায় কোন মুসলিম দেশে নারীদেরকে পাথর ছুড়ে হত্যার ফতোয়া দেয়া হল, বোরকা চাপিয়ে দেয়া হল, কিংবা কোথায় হিল্লা বিয়েতে নারীকে বাধ্য করা হল! এ নিয়েই তাদের মাথা-ব্যাথা! হিন্দুধর্মের এমন স্ববিরোধী, মানবতাবিরোধী, নারী-বিদ্বেষী চরিত্র জানার পরও কোন্ যুক্তিতে হিন্দুধর্মকে আধুনিক-প্রগতিশীল দাবি করা হয়? নারীর প্রতি এতো বিদ্বেষ, হিংসা, ঘৃণা আর কোনো ধর্মে আছে কি-না আমার জানা নেই? ধর্মগুরু, ঈশ্বরতুল্য মনু ঠিক কী পরিমাণ নারী-বিদ্বেষী হলে বলতে পারেন : "নৈতা রূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়সি সংস্থিতিঃ/সুরূপং বা বিরূপং বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে॥" (৯:১৪), অর্থাৎ "যৌবনকালে নারী রূপ বিচার করে না, রূপবান বা কুরূপ পুরুষ মাত্রেই তার সঙ্গে সম্ভোগ করে।" (বাহ্! মনে হয় তাদের নিজেদের চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র!); আসুন, একই রকম আরেকটি মনুর শ্লোক দেখি—"স্বভাব এস নারীনাং নরাণামিহ দূষণম্/অতোহর্থান্ন প্রমাদ্যন্তি প্রমদাসু বিপশ্চিতঃ॥" (২:২১৩) অর্থাৎ "নারীর স্বভাবই হলো পুরুষদের দূষিত করা..."!

মহাভারত এবং নারী : সনাতন হিন্দুধর্মাবলম্বীদের কাছে আরেকটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে মহাভারত; যদিও ইদানীং অনেকে একে মহাকাব্য হিসেবে বিবেচনা করেন, তবে বেশিরভাগ ধর্মাবলম্বীদের কাছে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে 'মহাভারতের কথা অমৃতসমান' বিবেচিত হয়। পণ্ডিতেরা বলেন মহাভারতের রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টাব্দ চতুর্থ শতকের মধ্যে এবং কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের কাল (যদি বাস্তবে কখনো সে যুদ্ধ ঘটে থাকে) মোটের উপর খ্রিস্টপূর্ব নবম শতক। মহাভারতেও নারী সম্পর্কে মনুসংহিতার প্রভাব পড়েছে তীব্রভাবে, এসেছে নারী সম্পর্কে অনেক হীন বক্তব্য; যার সামান্য কয়েকটি আগ্রহীদের জন্য তুলে ধরা হচ্ছে : মহাভারতের অসংখ্য চরিত্রের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হচ্ছে ভীষ্ম, তাঁর মধ্যেও স্পষ্টরূপে মনুর ছায়া পরিলক্ষিত হয়, তিনি বলেন (১৩/৩৮), "উহাদের (স্ত্রীলোকদের) মত কামোন্মত্ত আর কেহই নাই। ... কাষ্ঠরশি যেমন অগ্নির, অসংখ্য নদীর দ্বারা যেমন সমুদ্রের ও সর্বভূত সংহার দ্বারা অন্তকের তৃপ্তি হয় না, তদ্রুপ অসংখ্য পুরুষ সংসর্গ করিলেও স্ত্রীলোকের তৃপ্তি হয় না।"। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও গুরু ভীষ্মের মতোই, তাঁর মুখেও শোনা যায় তীব্র নারীনিন্দা, "উহারা (নারীরা) ক্রিয়া-কৌতুক দ্বারা পুরুষদিগকে বিমোহিত করে। উহাদিগের হস্তগত হইলে প্রায় কোনো পুরুষই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। গাভী যেমন নূতন নূতন তৃণভক্ষণ করিতে অভিলাষ করে, তদ্রুপ উহারা নূতন নূতন পুরুষের সহিত সংসর্গ করিতে বাসনা করিয়া থাকে" (১৩/৩৯)। আবারো পঞ্চপাণ্ডবের মহাজ্ঞানী পিতামহ ভীষ্মের উপলব্ধি, "মানুষের চরিত্রে যত দোষ থাকতে পারে, সব দোষই নারী ও শূদ্রের চরিত্রে আছে। জন্মান্তরীয় পাপের ফলে জীব স্ত্রীরূপে (শূদ্ররূপেও) জন্মগ্রহণ করে" (ভীষ্মপর্ব ৩৩/৩২); "স্ত্রীগণের প্রতি কোন কার্য বা ধর্ম নেই। (কারণ) তারা বীর্যশূণ্য, শাস্ত্রজ্ঞানহীন।" (অনু, ১৩/৩৯) এরপরেও নাকি মহাভারতের কথা অমৃতসমান! (সূত্র : *মনুসংহিতা ও নারী*, পৃষ্ঠা ৭২-৭৬) "তুলাদণ্ডের একদিকে যম, বায়ু, মৃত্যু, পাতাল, দাবানল, ক্ষুরধার বিষ, সর্প ও বহ্নিকে রেখে অপরদিকে নারীকে স্থাপন করিলে ভয়ানকত্বে উভয়ে সমান-সমান হবে" (অনুশাসনপর্ব ৩৮)। ব্রাহ্মণ্যধর্মের 'সম্পূর্ণ ধর্মগ্রন্থ' রূপেই এখন গীতার স্থান; এবং কারো কারো কাছে আধুনিক ধর্মগ্রন্থ! গীতাকে বলা হয়, শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী, ভগবদগীতা। কিন্তু এই গীতাতেও দেখি ভগবানের কণ্ঠে

মনুর বক্তব্য! শ্রীমদ্ভগবদগীতায় পঞ্চপাণ্ডবের শ্রেষ্ঠ বীর শ্রীমান অর্জুনের মুখে শুনি—"অধর্মাভিভাবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ/স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥" (গীতা, ১:৪০) অর্থাৎ "হে কৃষ্ণ, অধর্মের আবির্ভাব হলে কুলস্ত্রীরা ব্যভিচারিণী হয়। হে বার্ষ্ণেয়, কুলনারীগণ ব্যভিচারিণী হলে বর্ণসংকরের সৃষ্টি হয়"। এর পরেই বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি হলে কি হয়, তারও উত্তর রয়েছে : "সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ/পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥" (গীতা, ১:৪১) অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর, কুলনাশকারীদের এবং কুলের নরকের কারণ হয়। শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি ক্রিয়ার লোপ হওয়াতে ইহাদের পিতৃপুরুষ নরকে পতিত হয়।" এই উক্তিগুলো পঞ্চপাণ্ডবের এক ভাই অর্জুনের; মেনে নিচ্ছি ভগবদগীতায় শ্রী ভগবানের উক্তিই প্রামাণ্য, অর্জুনের নয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের বক্তব্য খণ্ডন তো করেনই নি, বরঞ্চ সে বক্তব্যকে পুরোপুরি সমর্থন করে এবং অর্জুনকেও ছাড়িয়ে গিয়ে নারীদের 'পাপযোনি' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন : "মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহ্যপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ/স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেপি যান্তি পরাং গতিম্॥" (গীতা, ৯:৩২) অর্থাৎ "আমাকে আশ্রয় করে স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র এসব পাপযোনিরাও পরম গতি লাভ করে থাকে"। এরপরই দয়ময় ভগবান ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিদের ভক্তিতে গদগদ হয়ে বলেন : "কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা/অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥" (৯:৩৩) অর্থ হচ্ছে "পুণ্যশীল ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিগণ যে পরম গতি লাভ করিবেন তাহাতে আর কথা কি আছে? অতএব আমার আরাধনা কর। কারণ এই মর্তলোক অনিত্য এবং সুখশূণ্য।" পাঠক, বত্রিশ নম্বর শ্লোকে লক্ষণীয় যে, নারীর সাথে বৈশ্য ও শূদ্ররা পাপযোনিভুক্ত, শুধু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বাদে! কিন্তু নারী যদি কোনো ব্রাহ্মণের মেয়ে হয় তবুও সে ভগবানের দৃষ্টিতে পাপযোনিভুক্ত। বুঝা যাচ্ছে, ভগবানের কাছে নারীর আলাদা কোনো জাত বা বর্ণ নেই; সব নারীই পাপযোনিভুক্ত। কিন্তু খটকা লাগে, কোনো ব্যক্তির নিজের জন্মের উপর নিজের কি কোনো হাত থাকতে পারে? যদি হাত নাই থাকে, তবে নারী, বৈশ্য, শূদ্ররা পাপযোনিভুক্ত হয় কী করে? তাছাড়া এ ধরনের নোংরা বক্তব্য কী কোনো ধর্মগ্রন্থে থাকতে পারে? এ ধরনের নোংরা বাণী এখানেই শেষ নয়, আরো আছে; প্রচুর পরিমাণে আছে। নারীদের নিয়ে হিন্দু ভগবান থেকে শুরু করে মুনি-ঋষি, ঠাকুর-পুরোহিত, রাজন্যবর্গ কারোর-ই চিন্তার শেষ নেই। নারী অমুক, নারী তমুক! অনেকেই ভাবতে পারেন, হিন্দুধর্মের দৃষ্টিতে নারী বোধহয় কখনোই ভালো নয়? না, না। এরকমটি নয়। হিন্দু মুনি-ঋষিরা ভালো নারী-ধর্মচারী নারীর বৈশিষ্ট্য ঠিক করে দিয়েছেন! তাদের দৃষ্টিতে সতী-সাধ্বী-ধর্মচারিণী হচ্ছে—"ন চন্দ্রসূর্যৌ ন তরুং পুন্নাম্নো যা নিরীক্ষতে/ভর্তৃবর্জং বরারোহা সা ভবেদ্ধর্মচারিণী॥ (মহাভারত, ১২/১৪৬/৮৮) অর্থাৎ "যে নারী স্বামী ব্যতীত কোনো পুংলিঙ্গান্ত (নামের বস্তু), চন্দ্র, সূর্য, বৃক্ষও দর্শন কওে না, সে-ই ধর্মচারিণী।" ওরেবাব্বা! দেখলেন তো! ধর্মচারিণী হতে হলে কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন? এতো দেখি পর্দাপ্রথা থেকেও চূড়ান্ত ও উন্মত্ত সংস্করণ! সনাতন ধর্মাবলম্বীরা এরপরেও কোন মুখে দাবি করেন, তাদের ধর্ম প্রগতিশীল, তাদের ধর্মে নারী সম্পর্কে কোনো বাজে ধারণা নেই? না জেনে দাবি করে বসলে আমার কিছু বলার নেই? কিন্তু জেনে-শুনে যারা এগুলো গোপন করে নিজেদের ধর্ম যুগোপযুগী, নারী-মুক্তির পক্ষে কিংবা নারী-মুক্তি হিন্দু ধর্মেই রয়েছে বলে সাফাই গান, তাদের জন্য বাংলা ভাষায় একটা ভদ্র শব্দ প্রচলিত আছে, তা হল 'চশমখোর'! হিন্দুধর্ম নারীকে বিন্দুমাত্র মানুষের মূল্য দেয় না; নারী শুধুমাত্র পণ্য, নারীর নিজস্ব কোনো অধিকার নেই, নেই স্বাধীনতা; এখনো হিন্দুধর্মাবলম্বীদের বিয়ের সময় কন্যাদান করা হয় পুরুষের (স্বামী/প্রভু) কাছে যজ্ঞ-মন্ত্র ইত্যাদি আনুষ্ঠানিকতা মেনেই। বৈদিকযুগ থেকেই বিয়ের সময়ই কন্যাদান নয়, অহরহই যে কোনো অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে ক্ষত্রিয় রাজা বা ঠাকুর-পুরোহিত-ব্রাহ্মণদের মনোরঞ্জনের জন্য নারীদের দান করা হতো, দেখুন পবিত্র মহাভারতের কিছু নমুনা : মহাভারতের কথিত শ্রেষ্ঠ সত্যবাদী যুধিষ্ঠির নিজেও যজ্ঞে-দানে-দক্ষিণায় বহুশত নারীকে দান করে দিতেন অবলীলায় অতিথিরাজাদের আপ্যায়নে (আশ্বমেধিকপর্ব ৮০/৩২, ৮৫/১৮)! রাজাদের লালসার তো শেষ নেই! শুধু ক্ষত্রিয় রাজারা ভোগের জন্য নারী পেলে তো হবে না, অমৃতের সন্তান ব্রাহ্মণেরা কী দোষ করলো তবে! চিন্তার কিছু নেই, ওদের জন্যও ব্যবস্থা আছে। শ্রাদ্ধের-দক্ষিণার তালিকাতে পুরোহিত ব্রাহ্মণদের নারী দান করার বিধান রয়েছে, দেখুন : আশ্রমবাসিকপর্ব ১৪/৪, ৩৯/২০, মহাপ্রস্থানপর্ব ১/৪, স্বর্গরোহণপর্ব ৬/১২,১৩।

যাহোক, এই ইহজগতে না হয় দুদর্মনীয় কামভোগের একটা ব্যবস্থা করা গেল, কিন্তু মৃত্যুর পর কী হবে? মরণের পরেও তো সুখ-শান্তির ব্যবস্থা থাকা চাই। চিন্তা নেই, তারও রেডিমেড ব্যবস্থা আছে। যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতো যুদ্ধ করে মারা গেলে স্বর্গে পাওয়া যাবে অসংখ্য সুন্দরী নারী। প্রমাণ চাই তো নিশ্চয়ই! দেখুন : বনপর্ব ১৮৬-১৮৭, কর্ণপর্ব ৪৯/৭৬-৭৮, শান্তিপর্ব ৬৪/১৭, ৩০; ৯৬/১৮, ১৯, ৮৩, ৮৫, ৮৬, ৮৮, ১০৬; **রামায়ণের** অযোধ্যাকাণ্ড ৭১/২২, ২৫, ২৬, সুন্দরকাণ্ড ২০/১৩। (সূত্র : *প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য*, পৃষ্ঠা ৬৩)

নারীর জন্য নয় কোনো ধর্মগ্রন্থ : পাঠক, এবার আলোচনায় ইতি টানতে হচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরেই তো দেখলেন-পড়লেন হিন্দুধর্মীয় অনুশাসনগুলো। কি মনে হয়? এই ধর্মীয় অনুশাসনগুলো কী নারীদের পক্ষে, কিংবা ওগুলোতে কি নারীদের প্রতি ইতিবাচক কোনো বক্তব্য আছে? (অস্বীকার করছি না, কোথাও কোথাও হয়তো ভাসা-ভাসা আছে, কিন্তু সার্বিকভাবে দেখলে, কখনোই বলা যাবে না, হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো নারীদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে) কেউ কেউ হয়তো পুরানো সেই ভাঙা রেকর্ড—'ভগবানের কাছে নারী-পুরুষ সবই সমান' বাজিয়ে বলবেন ওগুলো এক-আধটু সব ধর্মেই আছে, এতে দোষের কিছু নেই! এসব কথা শুনলে বড্ড হাসি পায়; করুণা হয় সনাতনপন্থীদের প্রতি! সনাতনপন্থীদের কথা এবার বাদ দেই, অনেকে হয়তো ভাবছেন, নারীর প্রতি এতো অবমাননা, অশ্লীল বক্তব্য থাকার পরও নারীরা এ হীন অবস্থানকে মেনে নিলেন কেন? প্রশ্নটা আমাকেও ভাবিয়েছে অনেকদিন। আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে মনে হয়, তৎকালীন পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা শুধু এগুলোকে ধর্মীয়-বিধান বলেই মানতে বাধ্য হয়েছিলেন; না হলে নির্ঘাত বিদ্রোহ হত। সেকালে নারীরা কোনো ধরনের শিক্ষা পাননি; খুব পরিকল্পিতভাবেই তাদেরকে ধর্মগ্রন্থ এবং অন্যান্য জ্ঞানার্জন থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। নারীর সবরকম মানবিক ও সামাজিক অধিকারকে অস্বীকার করে পুরুষদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল ভোগের জন্য আর সন্তান উৎপাদনের জন্য; তবে সে সন্তান হতে হবে ছেলে। মেয়ে জন্মের পরই মাথায় ঢুকানো হত 'জন্মান্তরবাদ' ও 'কর্মবাদ'-এর তত্ত্ব। মনুর মতো শাস্ত্রকাররা নারীদের বুঝাতেন, নারীর জন্ম হল আজন্ম পাপের ফল...! মনুসংহিতাসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে বোঝা যায়, ব্রাহ্মণপুরুষ কর্তৃক রচিত ওগুলো একেকটা 'পুরুষসংহিতা'; নারীদের (যে বর্ণের হোক) জন্য নয় ওগুলো। নারী যদি মুক্তি চায়, প্রগতির দিকে হাঁটতে চায়, নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে চায় পূর্ণরূপে, তবে অবশ্যই-অবশ্যই তাদের 'ধর্মকারায়' বজ্র হেনে বেড়িয়ে আসতে হবে। ধর্মগ্রন্থের যতই সাহিত্যিকমূল্য কিংবা দার্শনিক তত্ত্ব লুকানো থাকুক না কেন, নারীকে এর ভার বহন করার প্রয়োজন নেই। নারীর এতে কোনো ক্ষতি হবে না, কোনো অংশ ক্ষসে পড়বে না। বরং আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা, যুক্তিবাদ আর অসাম্প্রদায়িক মনোভাবই পারে নারীর সার্থক মুক্তি ঘটাতে; এতেই নারীর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ মর্যাদা বিকাশিত হবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

(১) সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভূমিকা, অনুবাদ, টীকা), ২০০২, মনুসংহিতা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
(২) শ্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ (সম্পাদিত), ১৯৯৭, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলকাতা।
(৩) কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৮, ধর্ম ও নারী, এলাইড পাবলিশার্স, কলকাতা।
(৪) কঙ্কর সিংহ, ২০০৫, মনুসংহিতা ও নারী, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা।
(৫) সুকুমারী ভট্টাচার্য, ২০০২, প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
(৬) সা'দ উল্লাহ, ২০০২, নারী অধিকার ও আইন, সময় প্রকাশন, ঢাকা।
(৭) মাহমুদ শামসুল হক, ১৯৯৬, নারীকোষ, তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা।
(৮) প্রবীর ঘোষ, ১৯৯৪, যুক্তিবাদের চোখে নারী-মুক্তি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।